ফেলুদা সমগ্র

গোলাপী মুক্তা রহস্য

সত্যজিৎ রায়

BENGALIEBOOK.COM
2021

সূচিপত্র

১. সোনাহাটিতে দেখবার কী আছে 2
২. আতিথেয়তায় মল্লিকমশাই পয়লা নম্বর 6
৩. হাওড়া এক্সপ্রেস 13
৪. জয়চাঁদ বড়ালের কথা 18
৫. মগনলাল আন্দাজ করছে 21
৬. বিস্ফোরণটা হল শুক্রবার 27
৮. নিরঞ্জনবাবু 32
৮. বেনারসে দ্বিতীয়বার এসে 36
৯. গোলাপী মুক্তা সগৌরবে বিরাজমান 45

১. সোনাহাটিতে দেখবার কী আছে

সোনাহাটিতে দেখবার কী আছে মশাই? লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন।

বাংলায় ভ্রমণ-এ যা বলছে, তাতে একটা পুরনো শিবমন্দির থাকা উচিত, আর একটা বড় দিঘি থাকা উচিত। নাম বোধহয় মঙ্গলদিঘি। ওখানকার এককালের জমিদার চৌধুরীদের কীর্তি। সোনাহাটি বিশ বছর আগে অবধি ছিল একটা গাঁ। এখন ইস্কুল, হাসপাতাল, হোটেল সবই হয়েছে।

লালমোহনবাবু ঘড়ি দেখলেন। এটা সম্প্রতি কেনা একটা কোয়ার্টজ ঘড়ি। বললেন, সাংঘাতিক অ্যাকিউরেট টাইম রাখে।

আর দশ মিনিট, ঘড়ি দেখে বললেন ভদ্রলোক। আমরা তিনজন এবং আরেকটি ভদ্রলোক-নাম নবজীবন হালদার-সোনাহাটি যাচ্ছি। ওখানকার রিক্রিয়েশন ক্লাব থেকে নেমন্তন্ন পেয়ে। ওরা ফেলুদা আর নবজীবনবাবুকে সংবর্ধনা দেবে ওদের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে। নবজীবনবাবু ইতিহাসের নামকরা অধ্যাপক, বই-টইও আছে দু-তিনটে। আমরা থাকব। দুদিন, ওখানকার সবচেয়ে নামকরা বড়লোক পঞ্চানন মল্লিকের গেস্ট হয়ে; মল্লিক হলেন ব্রিক্রিয়েশন ক্লাবের প্রেসিডোন্ট। তাঁর নাকি নানারকম পুরনো জিনিসের সংগ্রহ আছে।

আপনি যে এই নেমন্তন্ন অ্যাক্সেপ্ট করবেন। সেটা কিন্তু আমি ভাবিনি, ফেলুদাকে উদ্দেশ করে বললেন জটায়ু।

ফেলুদা বলল, আর কিছু না-দুদিনের জন্য যদি কলকাতার বিষাক্ত বায়ু থেকে রেহাই পাওয়া যায় তো মন্দ কী? তা ছাড়া ওখানে আমার এক কলেজের সহপাঠী আছে, নাম সোমেশ্বর সাহা। ওকালতি করে।

আমাদের ট্রেন মোটামুটি ঠিক সময়ই সোনাহাটি পৌঁছে গেল। আমরা নামতেই একটা দল আমাদের দিকে এগিয়ে এল-তাদের মধ্যে দুজনের হাতে ফুলের মালা। একজন ফেলুদার গলায় মালা পরিয়ে নমস্কার করে বলল, আমি ক্লাবের সেক্রেটারি-নরেশ সেন। আমিই আপনাকে চিঠিটা লিখেছিলাম।

নবজীবনবাবুকেও মালা পরানো হয়েছিল। এবার একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক–সিল্কের পাঞ্জাবিতে সোনার বোতাম-এগিয়ে এলেন; নরেশ সেন বলল, ইনিই হচ্ছেন আমাদের ক্লাবের প্রেসিডোন্ট পঞ্চানন মল্লিক।

মল্লিকমশাইয়ের মুখে স্বাগতম হাসি। বললেন, আপনারা যে আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছেন সেটা আমাদের পক্ষে গৌরবের বিষয়। আমার বাড়িতে আপনাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। আশাকরি কোনও অসুবিধা হবে না। বড় শহরের সব ফ্যাসিলিটিজ তো এখানে পাবেন না।

ও নিয়ে আপনি কোনও চিন্তা করবেন না, কলাল ফেলুদা।

আপনিও তো শুনিচি খ্যাতিমান ব্যক্তি, লালমোহনবাবুর দিকে ফিরে বললেন ভদ্রলোক।

আমি লিখি-টিখি আর কী, বিনয়ী হাসি হেসে বললেন জটায়ু।

মল্লিকমশাইয়ের নীল অ্যাম্বাসাডর স্টেশনের বাইরেই অপেক্ষা করছিল, আমরা পাঁচজন তাতে উঠে পড়লাম-আমি আর জটায়ু সামনে।

আপনার সংগ্রহের কথা শুনেছি, গাড়ি রওনা হবার পর বলল ফেলুদা। বোধহয় কাগজেও দেখেছি।

হ্যাঁ-ওটা আমার অনেকদিনের শখ। অনেক রকম জিনিস আছে আমার কাছে। হালদারমশাইও ইন্টারেস্ট পাবেন, কারণ বেশ কিছু জিনিসের সঙ্গে ইতিহাস জড়িয়ে আছে। আমার লেটেস্ট সংগ্রহ হল মহর্ষির জুতো।

মহর্ষির জুতো? সেটা কী ব্যাপার? ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন লালমোহনবাবু।

সে ঘটনা জানেন না? হালদারমশাই নিশ্চয়ই জানেন।

কী ব্যাপার?

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। তখন যুবা বয়স, খুব শৌখিন লোক। ঐশ্বর্যে ডুবে আছেন। একবার এক জায়গা থেকে নেমন্তন্ন এল, সেখানে কলকাতার সব রুইস আদমিরা যাবেন। মহর্ষি গেলেন। কলকাতার বিখ্যাত বাবুমশাইরা মাথা থেকে পা পর্যন্ত মহামূল্য পোশাক আর অলঙ্কারে ঢেকে এসেছেন। কাশ্মীরি দোরোখা আর জামিয়ার শালে চতুর্দিক ঝলমল করছে। তারই মধ্যে দেখা গেল দেবেন্দ্রনাথ এলেন, পরনে সাদা চোগা, সাদা চাপকন, তার উপরে নকশাহীন সাদা শাল জড়ানো। সকলে তো অবাক। এ কী ব্যাপার? মহর্ষির এই দৈন্যদশা কেন? তারপর সকলের চোখ গেল মহর্ষির পায়ের দিকে। এক জোড়া সাদা নাগরা, তাতে দুটি বিশাল বিশাল হিরে ঝলমল করছে।

সেই জুতো আপনি পেয়েছেন? অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবু।

একটি। একটি পেয়েছি। –হিরে সমেত। দেখাব আপনাদের।

পঞ্চাননবাবুর বাগানে ঘেরা বিশাল দোতলা বাড়ি দেখলেই বোঝা যায় তিনি বড়লোক। গাড়িবারান্দার তলায় গিয়ে গাড়ি থামল। আমরা সবাই নামলাম। সদর দরজায় দুজন বেয়ারা আর একজন দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে, মল্লিকমশাই একজন বেয়ারাকে বললেন, বৈকুণ্ঠ, যাও এদের ঘর দেখিয়ে দাও। আর এখন তো সোয়া বারোটা; একটার মধ্যে যাতে খাবার ব্যবস্থা হয় সেটা দেখো।

আমরা শ্বেতপাথরের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে লাগলাম। মল্লিকমশাই বললেন, আপনাদের ঘটনা তো সেই সন্ধ্যায়) ও সময়টা কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা; আশাকরি গরম কাপড় আছে সঙ্গে।

পৌষ মাসে গ্রামাঞ্চলে ঠাণ্ডা হবে সেটা আমরা জানতাম, বলল ফেলুদা। একটা প্যাসেজের দুদিকে তিনটে ঘর আমাদের জন্য রাখা হয়েছে। হালদারমশাই তাঁর ঘরে চলে গেলেন, আমরা তিনজন গিয়ে ঢুকলাম ফেলুদার আর আমার ঘরে। চিনেমাটির টুকরো দিয়ে ঢাকা মেঝে, যাকে ইংরিজিতে বলে □□□□□ □□□□□। এককালে টানা-পাখার ব্যবস্থা ছিল সেটা দেয়ালের উপর দিকে ফুটা দেখলেই বোঝা যায়।

এঁর টাকা হচ্ছে তামার খনির টাকা, বলল ফেলুদা। আমার এক মক্কেল একে ভাল করেই চেনেন।

আবহাওয়াটা যে কলকাতার তুলনায় নির্মল সেটা এর মধ্যেই বোঝা যাচ্ছে, বললেন লালমোহনবাবু।

আমিও সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম। তা ছাড়া কানটাও আরাম পাচ্ছে। ট্রাফিক বলে কোনও ব্যাপার নেই; এখনও পর্যন্ত একটাও হর্ন শুনিনি।

একজন বেয়ারা একটা থালায় তিন গেলাস সরবত দিয়ে গেল। সেই সরবত খেতে না। খেতেই খবর এল যে নীচে খাবার ঘরে পাত পড়েছে।

২. আতিথেয়তায় মল্লিকমশাই পয়লা নম্বর

আতিথেয়তায় মল্লিকমশাই যে একেবারে পয়লা নম্বর সেটা খাবার বহর দেখেই বোঝা গেল। মাছের যে এতরকম জিনিস রান্না হতে পারে সেটা আমার ধারণাই ছিল না। ফেলুদা অল্প খায়, কিন্তু লালমোহনবাবু ভোজনরসিক—খুব তৃপ্তি করে খেলেন। ওঁর খুশির আরেকটা কারণ হচ্ছে যে পঞ্চাননবাবু ওঁর লেখা সম্বন্ধে বেশ কয়েকটা প্রশ্ন করছিলেন তাই ভদ্রলোক নিজের ঢাক পেটাবার একটা সুযোগ পেলেন।

খাবার পর মল্লিকমশাই বললেন, এবার আপনাদের একটু এনটারটেন করব। চলুন আমার সংগ্রহের কিছু জিনিস দেখাই।

আমরা আবার দোতলায় ফিরে এলাম। এবার সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডান দিকে না ঘুরে বাঁ দিকে ঘুরলাম। এদিকেই পঞ্চাননবাবুর ঘর আর তাঁর সংগ্রহশালা।

জিনিসপত্র অনেকরকম জোগাড় করেছেন। ভদ্রলোক তাতে সন্দেহ নেই। তার প্রত্যেকটারই আবার একটা করে পরিচয় আছে। মহর্ষির নাগরাটা প্রথমেই দেখা হল, তারপর ক্রমে টিপুর নস্যির কৌটো, ক্লাইভের ট্যাঁকঘড়ি, সিরাজদ্দৌলার রুমাল, রানি রাসমণির পানবাটা-এ সবই দেখলাম। আমরা সকলেই অবিশ্যি খুবই তারিফ করলাম, কিন্তু আমার যেন কেমন-কেমন লাগিছিল। কোন জিনিসটা কার ছিল সেটা জানা গেল কী করে? ক্লাইভের ঘড়িতে তো আর ক্লাইভের নাম লেখা নেই। বা সিরাজদ্দৌলার রুমালেও নেই।

সব দেখেটেখে চারজনে ঘরে ফেরার পথে নবজীবনবাবু ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন মনে হল?

ফেলুদা বলল, খুব কনভিনসিং লাগল না। কনভিনসিং? ওর মধ্যে একটা জিনিসও জেনুইন নেই। লোকটা বাগাস, হামবাগ। মহর্ষির নাগরা থেকে তো রীতিমতো নতুন চামড়ার গন্ধ বেরোচ্ছিল।

ঘণ্টা তিনেক বিশ্রামের সময় ছিল, তারপর অনুষ্ঠানে যাবার জন্য তৈরি হয়ে নিলাম। ফেলুদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরিল বোধহয় আজ দশ বছর পর। ওকে পোশাকটা যে দারুণ মানায় সেটা স্বীকার করতেই হয়। লালমোহনবাবু একটা নকশাদার কাশ্মীরি শাল চাপিয়েছিলেন, বললেন সেটা ওঁর ঠাকুরদাদার ছিল।

ঠিক পৌনে ছটায় বেয়ারা পাঠিয়ে আমাদের ডেকে নিলেন পঞ্চাননবাবু। শীতকাল, তাই এর মধ্যেই বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে! অনুষ্ঠানের জায়গায় পৌঁছে দেখি আলোয় চারিদিক ঝলমল করছে। স্পটলাইট, ফুয়ারেসেন্ট লাইট, রঙিন বালব–কিছুরই অভাব নেই।

আমরা মঞ্চে গিয়ে বসলাম! সংবর্ধনার ব্যাপারটা একেবারে শেষে–অর্থাৎ ক্লাইম্যাক্স। তার আগে নাচ, গান, আবৃত্তি, নাটকের অংশের দৃশ্য–সবই হল। সকলেই আজ জান দিয়ে দিচ্ছে ফেলুদাকে ইমপ্রেস করার জন্য, ফেলুদাও হাততালিতে কার্পণ্য করছে না।

সংবর্ধনার ব্যাপারটা কুড়ি মিনিটে সারা হয়ে গেল! সময় একটু লাগল। মানপত্রটা পড়তে। এটা বলতেই হবে যে মানপত্র দুটো দেখতে বেশ ভাল হয়েছে, আর যে লিখেছে। তার হাতের লেখা খুব ভাল। সব শেষে কয়েকজন সাংবাদিক ফেলুদাকে ঘিরে ধরল, আর তাদের কিছু প্রশ্নের জবাবও দিতে হল ফেলুদাকে। সে বলল এখন তার অবসর–হাতে কোনও কেস নেই।

নবজীবনবাবু অনুষ্ঠানের শেষে পঞ্চাননবাবুর সঙ্গে বাড়ি ফিরে গেলেন, আমরা রয়ে গেলাম কারণ আমাদের নেমন্তান্ন আছে ফেলুদার সহপাঠী সোমেশ্বর সাহার বাড়িতে। ভিড় কমবার পরেই ভদ্রলোক হাসিমুখে ফেলুদার দিকে এগিয়ে এলেন।

চিনতে পারছিস?

অনায়াসে, বলল ফেলুদা। গোঁফটা ছাড়া আর প্রায় কিছুই বদলায়নি।

তুইও মোটামুটি একই রকম আছিস, তবে চোখে একটা দীপ্তি দেখছি যেটা বুদ্ধি পাকবার ফলে হয়েছে। কটা কেস হ্যান্ডল করলি এ পর্যন্ত?

হিসেব নেই, বলল ফেলুদা। গোড়ার দিকে হিসেব রাখতাম, আজকাল ছেড়ে দিয়েছি।

তোর সঙ্গে একজন আলাপ করতে ভীষণ আগ্রহী—সোমেশ্বর সাহা তাঁর পিছনে দাঁড়ানো এক ভদ্রলোককে পিঠে হাত দিয়ে সামনে আমাদের দিকে এগিয়ে দিলেন। —এঁর নাম জয়চাঁদ বড়াল। এখানকারই বাসিন্দা। ইনিই মানপত্রটা ডিজাইন করেছেন।

তাই বুঝি? বলল ফেলুদা। খুব ভাল হয়েছে। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলাম।

জয়চাঁদবাবু লজ্জায় ঘাড় নিচু করে বললেন, আপনার কাছ থেকে প্রশংসা পাব। এ কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবিনি। আমি আপনার একজন গুণমুগ্ধ ভক্ত।

আজি ইনিও আমাদের বাড়িতেই খাচ্ছেন, বললেন সোমেশ্বরবাবু। চ—এখানে দাঁড়িয়ে থেকে গেজিয়ে কোনও লাভ নেই। আমার বাড়ি বেশি দূর নয়। মিনিট দশেক পা চালাতে পারবি তো?

জরুর।

সোমেশ্বরবাবুর বাড়ি বড় না হলেও, বেশ গুছানো। সেটা বোধহয় ওঁর স্ত্রীর জন্য। স্ত্রী ছাড়া একটি দশ বছরের ছেলেও আছে ভদ্রলোকের। জয়চাঁদবাবু সমেত আমরা চারজনে বৈঠকখানায় বসার দশ মিনিটের মধ্যেই সরবত এসে গেল। স্ত্রী উমাদেবী বললেন, আগে সরবীতটা খান-সাড়ে নটার মধ্যে আপনাদের খাবার ব্যবস্থা করে দেব।

মিনিট পাঁচেক এটা-সেটা নিয়ে কথা হবার পর সোমেশ্বরবাবু জয়চাঁদ বড়ালকে দেখিয়ে বললেন, এঁর একটা বিশেষ কিছু বলার আছে তোকে। আমার মনে হয় তুই ইন্টারেস্ট পাবি।

বটে? বলল ফেলুদা। কী ব্যাপার শুনি।

কিছুই না, সলজ্জ হাসি হেসে বললেন জয়চাঁদবাবু, আমাদের ফ্যামিলি সংক্রান্ত একটা ব্যাপার।

লালমোহনবাবু আগ্রহের সঙ্গে একটু এগিয়ে বসলেন। কী ব্যাপার, কী ব্যাপার?-গল্পের গন্ধ পেলেই ভদ্রলোক চনমনিয়ে ওঠেন।

জয়চাঁদবাবু হাত থেকে সরবতের গেলাসটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে বললেন, আমি নিজে এখন ইস্কুল মাস্টারি করি, কিন্তু আমার পৈতৃক ব্যবসা ছিল হিরে-জহরতের। কলকাতার কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে আমাদের একটা গয়নার দোকান এখনও আছে; সেটা দেখেন আমার এক কাকা। আমি যাঁর কথা বলছি তিনি ছিলেন আমার ঠাকুরদাদার ঠাকুরদাদা-নাম ছিল। অভয়চরণ বড়াল। তিনিই এই ব্যবসা আরম্ভ করেন। জাহাজে করে ভারতবর্ষের উপকূলে সব শহরে গিয়ে হিরে পান্না কেনাবেচা করতেন। মাদ্রাজের কাছাকাছি কোনও একটা শহরে তিনি একবার একটা রত্ন, পান। সেটা তিনি যত্ন করে জমিয়ে রেখেছিলেন। সে ব্রত্ন এখনও আমার কাছে রয়েছে। সেটা আমি আপনাদের দেখাতে চাই।

সঙ্গে এনেছেন? জটায়ু প্রশ্ন করলেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা খয়েরি রঙের রুমাল বার করলেন, তাতে গেরো দিয়ে বাঁধা একটা ছোট্ট লাল ভেলভেটের বাক্স। বাক্স খুলে তার থেকে একটা মুক্তো বার করে ভদ্রলোক আমাদের সামনে ধরলেন।

ফেলুদা উত্তেজনায় ভরা চাপা স্বরে বলে উঠল–

একী-এ যে পিংক পার্ল!

আজ্ঞে হ্যাঁ, বললেন জয়চাঁদ বড়াল। অবিশ্যি গোলাপী হওয়ায় এর কোনও বিশেষত্ব আছে কি না জানি না।

কী বলছেন আপনি! বলল ফেলুদা। ভারতবর্ষে যতরকম মুক্তো পাওয়া যায় তার মধ্যে সবচেয়ে দুপ্রাপ্য আর সবচেয়ে মূল্যবান হল গোলাপী মুক্তো।

মুক্তো সাদা ছাড়া হয় তাই তো জানতাম না, বললেন লালমোহনবাবু।

সাদা লাল কালো হলদে নীল-সবরকম হয়, বলল ফেলুদা। তারপর জয়চাঁদবাবুর দিকে চেয়ে বলল, শুনুন-আপনি ও জিনিস ওভাবে পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াবেন না। বাড়িতে সিন্দুক থাকলে তাতে রেখে দেবেন।

আজ্ঞে এটা আমি বার করি না বললেই চলে। আজ। আপনাকে দেখাব বলে নিয়ে এলাম।

আর কাকে দেখিয়েছেন ওটা?

মাত্র একজন। গত সপ্তাহে একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন, তিনি উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি বণিকদের নিয়ে একটা বই লিখছেন-তাঁকে দেখিয়েছিলাম।

এ ছাড়া আর কেউ জানে না তো?

কী আর বলব বলুন—এই ভদ্রলোক, যিনি বই লিখছেন—তিনি আবার ঘটনাটা এক সাংবাদিককে বলেন। ফলে পরদিনই সেটা কাগজে বেরিয়ে যায়।

কলকাতার কাগজে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনটে বাংলা কাগজে বেরিয়েছে। আপনি ফিরে গিয়ে সেটা দেখতে পাবেন।

গোলাপী মুক্তো বলে বলা আছে তাতে?

তাই তো বলেছে। একটা কাগজে তো এ-ও বলে দিয়েছে যে মুক্তোর মধ্যে গোলাপী মুক্তোই সবচেয়ে ভ্যালুয়েবল।

সর্বনাশ! কপালে হাত ঠুকে বললে ফেলুদা। আমি আপনাকে জোর দিয়ে বলছি। এ জিনিস আপনি কাউকে কখনও দেখাবেন না। এই একটা মুক্তোর দাম কত তা আপনি কল্পনা করতে পারেন? বিক্রি করলে আপনি যা দাম পাবেন তাতে আপনার পরের দুই পুরুষ পর্যন্ত খাওয়া-পরার কোনও ভাবনা থাকবে না।

এটা আপনি আমাকে বলে খুব উপকার করলেন।

আমরা তিনজনেই একবার করে মুক্তোটা হাতে নিয়ে দেখলাম। নিটাল চেহারা। ফেলুদা বলল যে, শেপের দিক দিয়েও মুক্তোটা অসাধারণ।

জয়চাঁদবাবু তাঁর সম্পত্তি আবার পকেটে পুরে নিলেন। ফেলুদা ছিক করে একটা আক্ষেপসূচক শব্দ করে বলল, খবরটা কাগজে বেরোনো খুবই আনফরচুনেট ব্যাপার। আশা করি কোনও গোলমাল হবে না।

যদি হয় তা হলে কি আমি আপনাকে জানাব?

নিশ্চয়ই। আমার ঠিকানা, ফোন নম্বর সবই সোমেশ্বর জানে। আপনি বিনা দ্বিধায় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। এমনকী দরকার হলে ওটাকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসতে পারেন।

৩. হাওড়া এক্সপ্রেস

আমরা পরদিন সকালে হাওড়া এক্সপ্রেসে রওনা হয়ে বিকেলে কলকাতা পৌঁছে গেলাম। আমাদের সঙ্গে হালদারমশাইও ফিরলেন। দেখলাম ফেলুদা ওঁর সামনে একবারও গোলাপী মুক্তোর উল্লেখ করল না।

বাড়িতে এসে ফেলুদা শুধু একটা কথাই বলল।

মুক্তোর খবরটা কাগজে বেরোনোটা মারাত্মক ভুল হয়েছে।

আসবার তিন দিন পরে সকালে বসবার ঘরে বসে কথাসরিৎসাগর পড়ছি, ফেলুদা ক্লিপ দিয়ে নখ কাটছে, এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল। ফেলুদা উঠে। ধরল। কথা শেষ হয়ে যাবার পর ফেলুদা বলল, বড়াল।

কলকাতায় এসেছেন?

হ্যাঁ। আমার সঙ্গে বিশেষ দরকার। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় আসছে। কথা শুনেই বুঝতে পারলাম ভদ্রলোক খুবই উত্তেজিত।

আমরা ফোন করে লালমোহনবাবুকে ডাকিয়ে নিলাম! কোনও মামলার কোনও জরুরি অংশ থেকে বাদ পড়লে উনি বিশেষ ক্ষুন্ন হন। বলেন, কী ঘটছে কিছুই বুঝতে পারি না। ফলে চিন্তু করে যে আপনাকে হেলপ করব তারও উপায় থাকে না।

ভদ্রলোক ঠিক পাঁচটায় এসে পড়লেন, আর তার আধঘণ্টা পরে, শ্রীনাথ চা দেবার সঙ্গে সঙ্গে, এসে পড়লেন জয়চাঁদ বড়াল।

এ চেহারাই আলাদা! এই তিন দিনে ভদ্রলোকের উপর দিয়ে যে বেশ ধকল গেছে সেটা বাঝাই যায়। ইতিমধ্যে দুটো ইংরেজি কাগজেও পিংক পার্লের খবরটা বেরিয়ে আমাদের উৎকণ্ঠা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

জয়চাঁদবাবু এক গেলাস জল খেয়ে আক্ষেপের ভঙ্গিতে মাথাটা নাড়িয়ে বললেন, একটা খবরের কাগজের খবর থেকে যে এত কিছু ঘটতে পারে এ আমার ধারণা ছিল না। তিনটে ঘটনা আপনাকে বলার আছে। এক হচ্ছে আমার এক খুড়তুতো ভাই-নাম হচ্ছে মতিলাল বড়াল। -তার একটা চিঠি। সে বহুকাল থেকে বেনারসে আছে। একটা সিনেমা হাউস চালায়। সে লিখেছে যে যদি আমি মুক্তোগটা বিক্রি করি তা হলে যা পাৰ তার একটা অংশ তাকে দিতে হবে। মুক্তোটা পরিবারের সম্পত্তি, শুধু আমার একার নয়। চিঠিতে স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে যে মুক্তোর ব্যাপারটা আমি তার কাছ থেকে গোপন করে গেছি।

আর দুই নম্বর?

সেটাও একটা চিঠি, এসেছে ধরমপুর বলে উত্তরপ্রদেশের একটি শহর থেকে। আমি ইস্কুলের লাইব্রেরির বই ঘেঁটে জেনেছি যে ধরমপুর একটা করদ রাজ্য ছিল। যিনি চিঠিটা লিখেছেন তিনিই যে ধরমপুরের সর্বেসবা তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কারণ ঠিকানা হচ্ছে ধরমপুর প্যালেস। লেখকের নাম সূর্য সিং। এঁর নাকি মুক্তোর বিরাট কালেকশন আছে, কিন্তু গোলাপী মুক্তো নেই! মুক্তোটা উনি কিনতে চান! আমি কত দাম চাই সেটা অবিলম্বে তাঁকে জানাতে হবে।

আর তিন নম্বর?

সেটাই সবচেয়ে মারাত্মক। এক ভদ্রলোক-পশ্চিমা কিংবা মাড়োঁয়ারি হবে-পরশু। আমার বাড়িতে গিয়ে হাজির। তিনি অনেক কিছু কালেক্ট করেন। কথায় বুঝলাম সে সব জিনিস তিনি ভাল দামে বিদেশে পাচার করেন। জামাকাপড়, হাতের আংটি, কানের হিরে ইত্যাদি দেখে মনে হল খুব মালদার লোক।

এঁরাও কি মুক্তোটা চাই?

হ্যাঁ। তার জন্য তিনি চল্লিশ হাজার টাকা দিতে রাজি আছেন। আমি অবিশ্যি হ্যাঁ না। কিছুই বলিনি। তিন দিন সময় চেয়েছি। ভদ্রলোক এখন কলকাতায়। তাঁর চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এর বাড়ির ঠিকানা দিয়ে দিয়েছেন। আমাকে কাল সকাল দশটায় তাঁর কাছে গিয়ে একটা কিছু বলতে হবে। মনে হল ভদ্রলোক মুক্তোটা পেতে বদ্ধপরিকর। হয়তো দাম একটু বাড়াতে পারেন, কিন্তু মুক্তোটা ওঁর চাই।

এঁর নাম জানেন নিশ্চয়ই।

জানি।

কী?

মগনলাল! মগনলাল মেঘরাজ।

আমরা তিনজনেই কয়েক মুহূর্তের জন্য থ মেরে গেলাম। আর কতবার এই লোকটার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে? প্রতিপক্ষ হিসেবে এর চেয়ে সাংঘাতিক আর কাউকে কল্পনা করা যায় না। আর ইনিই গিয়ে হাজির হয়েছেন বড়ালমশাইয়ের কাছে? এঁরও দরকার হয়ে পড়েছে গোলাপী মুক্তো?

মুখে ফেলুদা বলল, আপনি সোজা না করে দেবেন। ওই মুক্তোর দাম ওর চেয়ে পাঁচগুণ বেশি। ভদ্রলোক এই পাথর মোটা দামে বিদেশে পাচার করবেন। দালালি করাই হচ্ছে, ওঁর ব্যবসা! ওঁকে আমরা পাঁচ বছর ধরে চিনি।

কিন্তু উনি যদি আমার কথা না শোনেন?

ফেলুদা একটু ভেবে প্রশ্ন করল, বেশ কড়া মেজাজে কথা বলছিলেন কি ভদ্রলোক? তা বলছিলেন বটে, বললেন জয়চাঁদবাবু এমনকী এ-ও বলেছিলেন যে ওঁর মুক্তোটা পাবার রাস্তা কেউ বন্ধ করতে পারবে না।

আপনি একটা কাজ করুন—মুক্তোটা আমাকে দিয়ে যান। আপনি সঙ্গে নিয়ে গেলে ওটা ও আদায় করে ছাড়বে। তার জন্য যদি খুনিও করতে হয় তাতেও পেছপা হবে না। লোকটা সাংঘাতিক।

কিন্তু ওকে আমি কী বলব?

বলবেন আপনি মুক্তোটা বেচবেন না। তাই ওটা আর সঙ্গে করে আনেননি। ওরকম একটা প্রেশাস জিনিস তো কলকাতায় পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো যায় না।

বেশ, তা হলে আপনিই রাখুন।

ভদ্রলোক আবার রুমালের গেরো খুলে বাক্স থেকে মুক্তোটা বার করে ফেলুদাকে দিলেন। ফেলুদা তৎক্ষণাৎ মুক্তোটা নিজের ঘরের গোদরেজের আলমারিতে রেখে দিল। তারপর ফিরে এসে সোফায় বসে বলল, আর সেই সূর্য সিংকে কী বলবেন? তিনিও বেশ নাছোড়বান্দা বলে মনে হচ্ছে।

তাঁকেও না করে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। দেড়শো বছরের ওপর জিনিসটা আমাদের কাছে রয়েছে, আর এখন হাতছাড়া হয়ে যাবে? আমার তো টাকার অভাব নেই, টাকার লোভও নেই। আমার তো চাকরি আছেই, তা ছাড়া বাড়ি আছে। ধান জমি আছে, চাষ করে মোটামুটি ভালই আয় হয়। তিনটি প্রাণী তো সংসারে—আমার দিব্যি চলে যায়।

দেখুন কাল সকালে কী হয়। যাই হোক না কেন, আমাকে জানিয়ে যাবেন। আমাকে জানিয়ে আসারও কোনও দরকার নেই।

ভদ্রলোক চা খেয়ে উঠে পড়লেন। উনি বেরিয়ে যাবার পর লালমোহনবাবু বললেন, এই রাহু থেকে আমাদের মুক্তি নেই। এবারে আর কী খেল দেখাবে কে জানে!

ফেলুদা বলল, তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে প্রতিবারই আমরা ওকে জব্দ করেছি।

সেটি ঠিক। ভূল কথা, আমার এক পাড়শী আছে। জহুরি, নাম রামময় মল্লিক। বীবাজারে দোকান আছে। –মল্লিক। ব্রাদার্স। ওঁকে গিয়ে পিংক পার্লের কথাটা বলতে ভদ্রলোকের চোখ কপালে উঠে গেল। উনিও কনফার্ম করলেন যে এত ভালুয়েবল মুক্তো আর হয় না।

ফেলুদা বলল, কাল সকালে কী হয় তার উপর সব নির্ভর করছে। মগনলাল যদি জেনে ফেলে জয়চাঁদবাবু আমার এখানে এসেছিলেন, তা হলেই মুশকিল।

আপনি মুক্তোটা নিজের কাছে রেখে একটা বড় রিস্ক নিয়েছেন।

ও ছাড়া কোনও রাস্তা ছিল না। ওটা না করলে মুক্তো কাল মগনলালের হাতে চলে যেত।

৪. জয়চাঁদ বড়ালের কথা

জয়চাঁদ বড়ালের কথা

চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউতে মগনলালের বাড়ি বার করতে বেশি সময় লাগল না। বাড়ির বাইরেটা দেখে ভিতরে ঢুকতেই ইচ্ছা করে না, কিন্তু একবার ঢুকে পড়লে দেখা যায় বেশ তক্‌তকে পরিচ্ছন্ন।

একজন চাকর এসে জয়চাঁদবাবুকে তিন তলায় নিয়ে গেল। তারপর একটা বারান্দা দিয়ে এগিয়ে গিয়ে একটা ঘরের দরজার সামনে পৌঁছে ঘোষণা করল যে বড়ালবাবু এসেছেন।

ভিতরে আসুন, মগনলালের গভীর গলায় শোনা গেল।

জয়চাঁদ বড়াল ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন।

মগনলাল এক পাশে গদিতে বসে আছে। অন্য পাশে সোফা রয়েছে, তারই একটাতে বড়াল বসলেন।

কী ডিসাইড করলেন? মগনলাল প্রশ্ন করল।

ওটা বেচব না।

মগনলাল কিছুক্ষণের জন্য চুপ। তারপর বলল, আপনি ভুল করছেন, জয়চাঁদবাবু। আমাকে রিফিউজ করে কোনও লোক রেহাই পায়নি। আপনি কি দাম বাড়াতে চাচ্ছেন?

না। আমি ওটা ফ্যামিলিতেই রাখতে চাই। চার পুরুষ ধরে রয়েছে, এখনও থাকুক।

আপনার বাড়ি যা দেখলাম সোনাহাটিতে, তাতে আপনার মানথিলি ইনকাম দেড়-দু হাজারের বেশি বলে মনে হয় না। আর এতে আপনি একসঙ্গে ক্যাশ অনেক টাকা পেয়ে যাবেন। হোয়াই আর ইউ বিইং সো ফুলিশ?

এটা বংশমর্য্যাদার ব্যাপার। এটা আমি আপনাকে বোঝাতে পারব না।

ওই মোতি কোথায় আছে?

আমার কাছে নেই।

ওটা আপনি আনেননি?

বেচবই না যখন ঠিক করলাম তখন আর আনিব কেন?

মগনলাল তার সামনেই রাখা একটা ঘণ্টার উপর চাপড় মারল। টুং শব্দের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা চাকর এসে ঘরে দাঁড়াল।

গঙ্গা–এই বাবুকে সার্চ করো।

গঙ্গা বেশ ষণ্ডা লোক; সে একটানে জয়চাঁদবাবুকে বসা অবস্থা থেকে দাঁড় করাল। তারপর সবঙ্গে সার্চ করে একটা মানিব্যাগ, একটা রুমাল আর একটা মশলার কৌটো বার করে মগনলালের সামনে রাখল।

ঠিক হ্যায়, বলল মগনলাল। ওয়াপিস দে দেনা।

চাকর জয়চাঁদবাবুকে তার জিনিসগুলো ফেরত দিয়ে দিল।

বসুন আপনি।

জয়চাঁদবাবু আবার সোফায় বসলেন। মগনলাল বলল, সোনাহাটিতে জানলাম কি আপনাদের ক্লাব প্রদোষ মিটারকে রিসেপশন দিয়েছে।

ঠিকই শুনেছেন।

তার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?

আপনার সব কথার জবাব দিতে তো আমি বাধ্য নই।

আপনার জবাবের দরকার নেই, বিকজ আই অলরেডি নো। আপনি যখন হাওড়াতে ট্রেন থেকে নামলেন, তখন থেকে আমার লোক আপনাকে নজরে রেখেছে। আপনি শিয়ালদায় যোগমায়া হোটেলে উঠেছেন। -রাইট?

ঠিক।

বিকেল পাঁচটার সময় হোটেল থেকে বেরিয়ে আপনি ট্যাক্সি করে সাউথে যান। আপনার ডেস্টিনেশন ছিল ফেলু মিটারের বাড়ি-রাইট?

আপনি তো সবই জানেন।

আপনার মোতি এখন ফেলু মিটারের জিন্মায় আছে।

জয়চাঁদবাবু চুপ করে রইলেন। মগনলাল বলল, ইউ হ্যাভ ডান সামথিং ভেরি স্টুপিড, মিস্টার বড়াল। আপনি পার্লটা আমাকে দিলে চালিস হাজার টাকা পেতেন। এখন আমি সে পার্ল আদায় করে নেব, আর আপনি আমার কাছ থেকে একটা পইসাও পাবেন না।

জয়চাঁদবাবু উঠে পড়লেন।

আমি তা হলে এখন আসতে পারি?

পারেন। আমাদের বিজনেস খতম। তবে আপনার জন্য আমার আপশোস হচ্ছে।

৫. মগনলাল আন্দাজ করছে

ফোন না করে দুপুর বারোটা নাগাত জয়চাঁদবাবু নিজেই এসে হাজির। মগনলালের সঙ্গে তাঁর কী ঘটল না ঘটল বর্ণনা দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, আপনি মুক্তোর ব্যাপারটা কী করবেন?

ফেলুদা বলল, যদ্দুর বুঝতে পারছি, মগনলাল আন্দাজ করছে যে মুক্তোটা আমার কাছে রয়েছে। লোকটা অত্যন্ত তুখোড়। সোজাসুজি যদি আমার কাছে এসে পড়ে তা হলেও আশ্চর্য হব না। যে জিনিসটা এতকাল আপনাদের ফ্যামিলিতে ছিল, সেটা এখন হাতছাড়া হয়ে যাওয়াতে আপনার মন খারাপ লাগবে সেটাও আমি বুঝি। কিন্তু তাও আমি বলব যে মুক্তোটা আমার কাছেই থাক। আপনার কাছে থাকলে ও যেন-তেন-প্রকারেণ ওটা আদায় করে নেবে। সেটা ভাল হবে না।

জয়চাঁদ রাজি হয়ে গেলেন। বললেন, আমি বিক্রি না করলে তো ও মুক্তোটা এমনিতেই পাবে না। আপদ বিদেয় হাক, তারপর ওটা আমার কাছে ফিরে যেতে পারে।

ঠিক কথা, বলল ফেলুদা। আপনি আজই ফিরছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ। সন্ধের গাড়িতে।

কোনও খবর থাকলে জানাতে ভুলবেন না।

পরদিন সকালে সাড়ে সাতটার সময় ফোন এল। সোনাহাটি থেকে। সোমেশ্বর সাহা। ফেলুদা কথা বলা শেষ করে ফোনটা রেখে গম্ভীর মুখ করে বলল, কাল রাত্তিরে ট্রেনে জয়চাঁদ বড়ালের মাথায় বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে কে বা কারা যেন তার বাক্স সার্চ করে। জিনিসপত্র সব ছত্রাকার হয়ে পড়ে ছিল। অবিশ্যি সোনাহাটি আসবার আগেই ভদ্রলোক জ্ঞান ফিরে পান।

আমি বললাম, এ-ও তো মগনলালেরই ব্যাপার।

নিশ্চয়ই বলল ফেলুদা। লোকটা কোনওরকম সুযোগ ছাড়ে না। ভাগ্যিস মুক্তোটা আমার কাছে রেখে দিয়েছিলাম।

একটা নতুন কেসের গন্ধ পেলে জটায়ু মাঝে মাঝে বিকেলেও এসে হাজির হন। আজও তাই হল। বললেন, মনটা পড়ে রয়েছে। এখানে তাই বাড়িতে বসে থাকতে ভাল লাগছিল না।

ফেলুদা লেটেস্ট খবরগুলো লালমোহনবাবুকে দিয়ে দিল।

তা হলে তো মনে হচ্ছে ওঁর পায়ের ধুলো এবার এখানে পড়বে। ও তো নির্ঘাত বুঝে গেছে যে মুক্তোটা আপনার কাছে রয়েছে।

লালমোহনবাবু কথাটা বলার পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাইরে একটা গাড়ি এসে যাবার শব্দ পেলাম। তারপর দরজার বেল বেজে উঠল। খুলে দেখি আসল লোক এসে হাজির।

মে আই কাম ইন, মিস্টার মিটার? বললেন মগনলাল।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

ভদ্রলোক ঢুকে এলেন। সেই কালো শেরওয়ানি আর ধুতি, পায়ে মোজা আর পাম্প শু। অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল কি আপনার বাড়িতে একবার আসি। আমাদের এতদিনের দোস্তি—হে হে হে! আঙ্কল কেমন আছেন?

লালমোহনবাবুকে মগনলাল যা নাস্তানাবুদ করেছে, ভদ্রলোক আর কোনওদিন মগনলালের সামনে স্বাভাবিক হতে পারবেন বলে মনে হয় না। শুকনো গলায় জটায়ু উত্তর দিলেন, ভাল আছি।

চা খাবেন? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

না স্যার। নো টি। আমি আপনার বেশি সময় নেব না। আমি কেন এসেছি তা বোধহয় আপনি বুঝতে পারছেন।

তা বোধহয় পারছি।

তা হলে আর টাইম ওয়েইস্ট করার দরকার নেই। হায়ার ইজ দ্যাট পার্ল? মিস্টার বড়ালের কাছে যে নেই তা তো আপনি জানেন। আপনার লোক তো ট্রেনে

আমার লোক? তা ছাড়া আর কার লোক হবে বলুন। আপনি এভাবে বলবেন না, মিস্টার মিটার। আপনার কোনও প্রমাণ নেই যে আমার লোক কাজটা করেছে।

আপনার ক্ষেত্রে প্রমাণের দরকার হয় না, মগনলালজী। আপনার কাজ মাকামারা কাজ। সে কাজ আমি দেখলেই বুঝতে পারি।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করছি–সে পার্ল কোথায় আছে?

আমার কাছে।

ওটা আমার দরকার।

যা দরকার তা কি সব সময়ে পাওয়া যায়?

মগনলাল মেঘরাজ ক্যান অলওয়েজ গেট ইট। কথা বলে সময় নষ্ট করে লাভ নেই, মিস্টার মিটার। আমার ওই পিংক পার্ল চাই। না হলে, আপনি তো জানেন, আমি যেমন করে হাক। ওটা আদায় করে নেব।

তা হলে সেটাই করুন, কারণ মুক্তো আমি আপনাকে দিচ্ছি না।

দেবেন না?

ভদ্রলোকের এক কথা।

তা হলে আমি আসি। মগনলাল উঠে পড়লেন। গুডবাই, আঙ্কল।

গুডবাই, ক্ষীণস্বরে বললেন জটায়ু।

দরজার কাছে গিয়ে মগনলাল নেমে ফেলুদার দিকে ঘুরলেন। তারপর বললেন, আমি তিন দিন সময় দিচ্ছি। আপনাকে। আজ সোমবার। সোম, মঙ্গল, বুধ। বুঝেছেন?

বুঝেছি।

মগনলাল বেরিয়ে গেলেন। লালমোহনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, ব্যাপারটা আমার ভাল লাগছে না মোটেই। দিয়ে দিন মশাই, দিয়ে দিন। আর আপনি কাছেই বা আর কত দিন রাখতে পারবেন। বড়ালকে তো তাঁর জিনিস ফেরত দিতে হবে—তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এত সাধের জিনিস।

যিদিন মুক্তো বেহাত হবার আশঙ্কা আছে ততদিন এটা বড়ালকে ফেরত দেওয়া যাবে না। সব সংশয় কাটিয়ে উঠলে পর যেখানের মুক্তো সেখানে যাবে।

কিন্তু বড়াল যে এক মহারাজার কথা বলছিল তার সম্বন্ধেও তো একটু খোঁজ নেওয়া দরকার।

সে খোঁজ দিতে পারেন সিধুজ্যাঠা। বহুদিন জ্যাঠার সঙ্গে দেখা হয়নি। চলুন। একবার ঘুরে আসি।

জায়গার নামটা মনে আছে?

ধরমপুর।

অরি মহারাজার নাম?

সূরয সিং।

আমরা লালমোহনবাবুর গাড়িতে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সিধু জ্যাঠার বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। জ্যাঠা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে একটা পুরনো পুঁথি পরীক্ষা করছিলেন, আমাদের দেখে গভীর হয়ে গেলেন।

তোমরা কে? তোমাদের তো আমি চিনি না।

ফেলুদা হেসে বলল, অপরাধ নেবেন না জ্যাঠা। পসারটা একটু বেড়েছে বলে আর লোকজনের বাড়িতে বিশেষ যাওয়া হয় না। আমি যে কাজে উন্নতি করছি তাতে আপনি নিশ্চয়ই খুশি।

এবার সিধুজ্যাঠার মুখে হাসি ফুটল।

ফেলুমিত্তির—তোমাকে কি আমি আজ থেকে চিনি? আট বছর বয়সে এয়ার গান দিয়ে শালিক মেরে এনে আমায় দেখিয়েছিলে। আমি বলেছিলাম নিরীহ জীবকে আর কক্ষনও মারবে না—কথা দাও। তুমি সেদিন থেকে পাখি মারা বন্ধ করেছিলে। গোয়েন্দাগিরিতে পসার হচ্ছে বলে আমার কাছে বড়াই কোরো না। গোয়েন্দা আমিও হতে পারতাম। তার সব গুণই আমার ছিল। এখনও আছে। তবে কোনওরকম কাজে বাঁধা পড়া আমার ধাতে সয় না। আমার সময় যদি আমি নিজে ইচ্ছামতো ব্যয় না করতে পারি তা হলো লাভটা কী? শার্লক হামসের এক দাদা ছিল জানতে? মাইক্রফট হোমস। জাত কুঁড়ে, কিন্তু বুদ্ধিতে সত্যিই শার্লকের দাদা। সেই দাদার কাছে শার্লক মাঝে মাঝে যেত। পরামর্শ নিতে। আমি হচ্ছি। সেই মাইক্রফুট। যাক গে, এখন বলো কী জন্যে আগমন?

একজন লোক সম্বন্ধে আপনার কাছে কোনও ইনফরমেশন আছে কি না জানতে এসেছিলাম।

কে সেই ব্যক্তি?

আপনি ধরমপুরের নাম শুনেছেন?

শুনব না কেন? উত্তরপ্রদেশের একটা করদ রাজ্য ছিল। আলিগড় থেকে সাতত্তর মাইল দক্ষিণে। ট্রেন নেই, গাড়িতে যেতে হয়।

তা হলে সূর্য সিং-এর সম্বন্ধেও নিশ্চয়ই জানেন? ওরে বাবা। –সে কি এখনও বেঁচে আছে?

হ্যাঁ।

সে যে একটি আস্ত বাঘ। মালটি মিলিওনেয়ার। হোটেলের ব্যবসার টাকা। হিরে জহরতের অত ভাল কালেকশন ভারতবর্ষে আর কারুর নেই।

লোক কেমন জানেন?

তা কী করে জানিব? সে কি আমার এই কুটিরে পদার্পণ করেছে, না। আমি তার বাড়ি গেছি? এ সব লোককে ভাল-খারাপ বলে বর্ণনা করা যায় না। তুমি হয়তে গিয়ে দেখলে তার মতো অতিথিবৎসল লোক আর হয় না–তোমাকে রাজার হালে রেখে দিল। আবার পরদিন হয়তো সেই লোকই তার কালেকশনের জন্য পাথর আদায় করতে একজনকে খুনই করে ফেলল। অবশ্য নিজে হাতে নয়; এরা সব সময় আইন বাঁচিয়ে চলে, যদিও তার জন্য ট্যাঁক খরচা হয়। অনেক।

এই খবরই যথেষ্ট বলে আমরা সিধুজ্যাঠাকে আর বিরক্ত করলাম না, যদিও সূর্য সিং-এর সঙ্গে আমাদের কারবার হচ্ছে কীভাবে সেটা এখনও বুঝতে পারলাম না। ফেলুদাকে বলতে ও বলল, তাও এ খবরগুলো জেনে রাখা ভাল। সে লোক যখন বড়ালকে চিঠি লিখেছে। তখনই বোঝা যাচ্ছে তার মুক্তোটার বিশেষ দরকার। সেটা পাবার জন্য সে কতদূর যেতে পারে। সেইটে দেখার প্রবল ইচ্ছা হচ্ছে।

৬. বিস্ফোরণটা হল শুক্রবার

মগনলাল বিষ্যুদবার পর্যন্ত টাইম দিয়েছিল ফেলুদা তার মধ্যে ওর সঙ্গে কোনওরকম যোগাযোগ করল না। আর বিস্ফোরণটা হল শুক্রবার সকালে।

আমিও ফেলুদার দেখাদেখি রোজ সকালে যোগব্যায়াম করি। সাড়ে ছাঁটায় সে ব্যাপার শেষ হয়েছে। ফেলুদার কোনও সাড়াশব্দ পাচ্ছি না দেখে আমি তার ঘরের দিকে গেলাম। দরজাটা ভেজানা ছিল। ঠেলে খুলতেই একটা দৃশ্য দেখে থ মেরে গেলাম।

ফেলুদা এখনও ঘুমোচ্ছে। এ যে অভাবনীয় ব্যাপার! এই সময়ের মধ্যে ফেলুদার স্নান ব্যায়াম দাড়ি কামানো সব শেষ হয়ে যায়। সে বসবার ঘরে খবরের কাগজ পড়ে। আজ কী হল?

আমি ফেলুদার দিকে এগিয়ে গেলাম। বার দু-এক ঠেলা দিয়ে আর নাম ধরে ডেকে বুঝতে পারলাম ওর হুঁশ নেই।

আমার দৃষ্টি গোদরেজের আলমারির দিকে চলে গেল। দরজা হাট হয়ে আছে। সামনে মেঝেতে জিনিসপত্র ছড়ানো।

ফেলুদার পালস দেখলাম। দিব্যি চলছে। দৌড়ে বসবার ঘরে গিয়ে আমাদের ডাক্তার ভৌমিককে টেলিফোন করে ব্যাপারটা বললাম। ভদ্রলোক দশ মিনিটের মধ্যে চলে এলেন।

ফেলুদাকে যখন পরীক্ষা করছেন তখনই ও নড়াচড়া আরম্ভ করেছে। ভৌমিক বললেন, মুকু জাতীয় কিছু ব্যবহার করা হয়েছে অজ্ঞান করার জন্য। কিন্তু লোক ঘরে ঢুকল করে?

সেটা আমি দু মিনিটের মধ্যে বার করে দিলাম। বাথরুমের উত্তর দিকে জমাদার ঢোকার দরজাটা খোলা।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই ফেলুদার জ্ঞান হল। ডাক্তার ভৌমিক ভরসা দিয়ে বললেন, কোনও চিন্তা নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবেন। তবে এরা কী ক্ষতি করেছে সেটা একবার দেখে নিন। আলমারি তো দেখছি খোলা।

তোপ্‌সে দেরাজটা একবার খুলে দেখ তো।

দেখলাম, কিন্তু সেই লাল ভেলভেটের কৌটো কোথাও পেলাম না। অর্থাৎ পিংক পার্ল উধাও।

ফেলুদা মাথা নেড়ে আক্ষেপের সুরে বলল, বাথরুমের দরজা বন্ধ করতে আমার কোনওদিন ভুল হয় না। কালও হয়নি। আসলে ছিটুকিনিটা ভাল কাজ করছিল না। কেন যে সারিয়ে নিইনি—কেন যে সারিয়ে নিইনি।

ডাক্তার ভৌমিক চলে গেলেন।

আমি ফেলুদার অবস্থা দেখেই লালমোহনবাবুকে ফোন করে দিয়েছিলাম। উনি এবার এসে পড়লেন।

পিংক পার্ল নেই? প্রথম প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক। আমি বললাম, না। ভদ্রলোক ফেলুদাকে উদ্দেশ করে বললেন, আমাকে হেলাফেলা করার রেজাল্টটা দেখলেন তো? আমি প্রথমেই বলেছিলাম-কাজটা ভাল হচ্ছে না। আপনার যে এই দশা করতে পারে সে লোক কী সাংঘাতিক ভেবে দেখুন। এখন কী করা?

ফেলুদা উঠে বসে চা খাচ্ছিল। বলল সে এখন হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট ফিট। বড়ালকে দুঃসংবাদটা এখনও দেব না। আগে দেখি মুক্তোটা উদ্ধার করতে পারি কি না।

টেলিফোনটা বেজে উঠল। আমি তুলে কথা বলে সেটা ফেলুদার হাতে চালান করে দিলাম। তোমার ফোন।

ফেলুদা মিনিট তিনেক কথা বলে ফোনটা রেখে বলল, সোনাহাটি থেকে সোমেশ্বর। বড়ালের খবর আছে। সূর্য সিং আবার চিঠি লিখেছে। মুক্তো তার চাই। সে সাত দিনের জন্য দিল্লি যাচ্ছে, সেখান থেকে ফিরে সোনাহাটি গিয়ে বড়ালের সঙ্গে দেখা করবে। সে এক লাখ টাকা অফার করছে। এত টাকা পাবে বড়াল ভাবেনি। সে এখন মুক্তোটা বেচে দেবার কথা ভাবছে। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাওয়াতে মুক্তোটা এখন ওর একটা অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বলছে আপদ বিদেয় করাই ভাল। আমি আর বললাম না যে মুক্তোটা মগনলালের হাতে চলে গেছে।

কিন্তু সেটা তো উদ্ধার করতে হবে, বললেন লালমোহনবাবু।

তা তো হবেই। সেটাই এখন আমাদের কাজ। তোপ্সে টেলিফোন ডিরেক্টরি থেকে মগনলালের ঠিকানাটা বার কর তো।

সাতষট্টি নম্বর চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, বই খুলে নম্বর দেখে বললাম।

চা খেয়েই বেরিয়ে পড়ব, বলল ফেলুদা।

এখন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বাধ করছেন তো? জিজ্ঞেস করলেন জটায়ু।

ইয়েস স্যার। পুলিশে খবর দেবেন না?

কী লাভ? তারা তো অনুসন্ধান করে নতুন কিছু বলতে পারবে না। সবই তো আমার জানা।

চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউতে মগনলালের বাড়ি যখন পৌঁছলাম, তখন বেজেছে নটা দশ। আমরা ভিতরে ঢুকছি। আর লালমোহনবাবু বিড়বিড় করছেন—আজ আবার কী খেল দেখাবে কে জানে!

কিন্তু তিনতলায় মগনলালের গদিতে পৌঁছে তাকে পাওয়া গেল না। তারই একজন কর্মচারী বলল, মগনলাল সকালে দিল্লি চলে গেছেন।

প্লেনে গেছেন? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

না, ট্রেন।

আমরা আবার নীচে নেমে এলাম। লালমোহনবাবু বললেন, আশ্চর্য ব্যাপার ইনিও দিল্লি গেছেন আর ওদিকে সূর্য সিংও দিল্লি গেছেন।

ব্যাপারটা ভেরিফাই করতে হবে, বলল ফেলুদা।

চতুর্দিকে ফেলুদার চেনা–রেলওয়ে আপিসেও বাদ নেই। অপরেশবাবু বলে বুকিং-এর এক ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে ফেলুদা জিজ্ঞেস করল, আজ সকালে দিল্লির কী কী ট্রেন আছে?

সোয়া নটায় আছে–এইট্টি ওয়ান। পরদিন সকালে দশটা চল্লিশে দিল্লি পৌঁছায়।

এ ছাড়া আর কিছু নেই?

না।

এবার রিজার্ভেশন চার্টটা দেখে বলুন তো মিস্টার মেঘরাজ বলে এক ভদ্রলোক এই ট্রেনে দিল্লি গেছেন কি না।

ভদ্রলোক চার্টের নামের উপর চোখ বুলিয়ে এক জায়গায় থেমে বললেন, মিস্টার এম. মেঘরাজ! ফার্স্ট ক্লাস এ. সি.। কিন্তু ইনি তো দিল্লি যাননি।

তা হলে?

বেনারস। বেনারস গেছেন। আজ রাত সাড়ে দশটায় পৌঁছবেন।

বেনারস।

কথাটা শুনে আমারও আশ্চর্য লাগিছিল, তবে এটা তো জানি যে মগনলালের বেনারসেও একটা বাড়ি রয়েছে। সেখানেই তো আমাদের সঙ্গে প্রথম আলাপ।

কাল সকালের দিকে বেনারস পৌঁছায় এমন কী কী ট্রেন আছে? ফেলুদা জিজ্ঞেস করলে।

আপনি দুটো সুবিধের ট্রেন পাবেন একটা অমৃতসর মেল, আর একটা ডুন এক্সপ্রেস। প্রথমটা ছাড়ে সন্ধ্যা সাতটা কুড়ি আর বেনারস পৌঁছায় পরদিন সকাল দশটা পাঁচ, আর অন্যটা ছাড়ে রাত আটটা পাঁচ। আর পৌঁছায় সকাল এগারোটা পনেরো।

ফেলুদা না হলে অবিশ্যি আমাদের রিজার্ভেশন পাবার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। সঙ্গে টাকা ছিল না। তাই বাড়ি ফিরতে হল। আবার রেল আপিসে ফিরে গিয়ে বারোটার মধ্যে রিজার্ভেশন হয়ে গেল। লালমোহনবাবু চলে গেলেন তাঁর বাড়িতে বাক্স গুছাতে। ফেলুদা বলে দিল, ক'দিনের জন্য যাচ্ছি। কিছু ঠিক নেই মশাই। আপনি এক হস্তার মতো জামাকাপড় নিয়ে নিন। ওদিকে কিন্তু খুব ঠাণ্ডা-সেটা ভুলবেন না।

ট্রেনে বলবার মতো একটা ঘটনাই হল। পরদিন সকালে সাড়ে সাতটায় বক্সারে খবরের কাগজ কিনে তাতে একটা জরুরি খবর পড়লাম; আমেরিকা থেকে একটা ব্যবসায়ীদের দল এসেছে, তারা যে সব ভারতীয়দের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছে তার মধ্যে সূর্য সিং একজন। ভদ্রলোকের দিল্লি যাবার কারণটা বোঝা গেল।

মিনিট পনেরো লেট করে আমাদের ট্রেন বেনারস পৌঁছে গেল।

৮. নিরঞ্জনবাবু

হোটেলে ফিরে ঘরে ঢোকার আগেই নিরঞ্জনবাবু তাঁর ঘর থেকে ডাক দিয়ে বললেন, একটি ভদ্রলোক আপনাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য অনেকক্ষণ থেকে বসে আছেন।

ম্যানেজারের ঘরে ঢুকে দেখি একটি মাঝারি হাইটের কালো ভদ্রলোক, বয়স চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ, ম্যানেজারের উলটা দিকে একটা চেয়ারে বসে আছেন। আমাদের দেখে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন।

আমার নাম মতিলাল বড়াল।

আপনি কি জয়চাঁদবাবুর ভাই?

খুড়তুতো ভাই। এখানে একটা সিনেমা হাউস আছে আমার।

চলুন, আমাদের ঘরে চলুন। কথা হবে।

আমরা চারজন আমাদের ঘরে এলাম। খাটে বসে ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, মুক্তোটা এখন কোথায়? জয়চাঁদের কাছে?

না।

তবে?

মগনলাল মেঘরাজের নাম শুনেছেন?

বাবা! তেইশ বছর কাশীতে আছি, আর মগনলালের নাম শুনব না?

মুক্তোটা তাঁরই কাছে আছে।

কিন্তু তিনি তো মুক্তো জমান না। তিনি তো দালাল; কম দামে জিনিস কিনে বেশি দামে বেচেন।

এবারেও তাই করবেন। ধরমপুরের সূর্য সিংকে উনি মুক্তোটা বেচবেন।

সূরয সিং এখানে আসছেন?

না। উনি দিল্লিতে। আমার যতদূর ধারণা, মগনলাল দিল্লি যাচ্ছেন ওঁর সঙ্গে দেখা করতে।

আপনি কী করছেন?

আমরাও দিল্লি যাব-যদি তার আগে মুক্তোটা আদায় করতে পারি।

মগনলাল যদি টাকা না পায়, তা হলে আমার ভাই পাবে তো?

সূর্য সিং যদি তাঁর কথা রাখেন তা হলে নিশ্চয়ই পাবেন।

আশ্চর্য! এমন একটা ভ্যালুয়েবল জিনিস ফ্যামিলিতে রয়েছে এতকাল ধরে, আর জয় সে কথা একবারও বলেনি। ও একই জিনিসটাকে আগলে রেখেছে।

আপনি জানতেন না এতে আমার খুব অবাক লাগছে।

আমি পনেরো বছর বয়স থেকে ঘর ছাড়া। তারপর আর সোনাহাটি যাইনি; কাগজে মুক্তোর কথাটা পড়ে জয়কে চিঠি লিখেছিলাম, যে বিক্রি যদি হয় তা হলে আমি যেন একটা শেয়ার পাই। ও লিখল আমি বিক্রি করব না। তারপর কাল একটা চিঠি পেয়েছি তাতে লিখেছে ও মাইন্ড চেঞ্জ করেছে, বিক্রি করবে। এই যে সেই চিঠি।

ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে দিলেন। ফেলুদা সেটা পড়ে ফেরত দিয়ে বলল, আপনাকে তো বিশ হাজার অফার করেছে, আপনি তাতে সন্তুষ্ট?

আরেকটু বেশি হলে আরও খুশি হতাম, তবে নেই-মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।

মুক্তোটা যে মগনলালের কাছে আছে সে বিষয়ে আপনি শিওর?

আমি নিজের চোখে দেখেছি।

মতিলালবাবু একটুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, আপনি যদি মুক্তোটা চান, তা হলে তো। আপনিই সেটা সূরয সিংকে বিক্রি করবেন?

তা তো বটেই, এবং তা হলেই আপনি আপনার শেয়ার পাবেন। তা হলে প্রথম কাজ হচ্ছে মগনলালের কাছ থেকে মুক্তোটা আদায় করা।

সে ব্যাপারে আপনি আমাকে হেলপ করতে পারেন?

আপনার কী দরকার?

বেপরোয় কাজ করতে পারে এমন কিছু লোক।

মতিলালবাবু কয়েক মুহূর্ত মাথা হেঁট করে কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, একটা কথা আপনাকে বলি, মিস্টার মিত্তির-আজকাল শুধু সিনেমা হাউস চালিয়ে সংসার চলে না। লোকেরা সব বাড়িতে বসে ছবি দেখে। তাই কিছু একস্ট্রা রোজগারের রাস্তা দেখতে হয়।

মানে গোলমেলে কাজ?

কিন্তু আইন বাঁচিয়ে।

তার মানে আপনার হাতে লোক আছে?

মগনলালের যে রাইট-হ্যান্ড ম্যান-মনোহর-সে। আমার দিকে চলে এসেছে। তা ছাড়া আরও দু-একজন লোক আমি দিতে পারি।

ভেরি গুড।

আপনি বলুন কখন কী করতে হবে।

আজ রাত বারোটা। জ্ঞান-বাপীতে চলে আসুন আপনার লোক নিয়ে। আমরা ওখানে থাকব।

ঠিক আছে। রাত বারোটা।

আপনি আবার গোঁয়ার্তুমি করছেন? বলে উঠলেন লালমোহনবাবু। ফেলুদা তাতে কানই দিল না। সে মতিলালবাবুকে বলল, মগনলালের কিন্তু একটি পালোয়ান ভৃত্য আছে। তার সঙ্গে মোকাবিলা করার কথাটা ভুললে চলবে না।

মতিলালবাবু হেসে বললেন, আমার মনোহরও পালোয়ান। তার উপরে মাথায় বুদ্ধি রাখে।

তা হলে ওই কথা রইল। রাত বারোটা, জ্ঞান-বাপী।

মতিলালবাবু উঠে পড়ে বললেন, একটা জরুরি কথা জিজ্ঞেস করা হয়নি। মুক্তোটা ও কোথায় রাখে জানেন?

জানি। ও নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না।

অল রাইট।

ভদ্রলোক চলে গেলে ফেলুদাও বিছানা থেকে উঠে পড়ে বলল, আমার নিরঞ্জনবাবুর সঙ্গে দু মিনিট দরকার আছে। সেটা সেরে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা সারা যাবে। বেশ খিদে পেয়েছে।

৮. বেনারসে দ্বিতীয়বার এসে

বেনারসে দ্বিতীয়বার এসেও সেই প্রথমবারের মতোই চমক লাগল। এবারও দশাশ্বমেধ রোডে ক্যালকাটা লজেই উঠলাম। ম্যানেজারও একই রয়েছেন-নিরঞ্জনবাবু। ঘর আছে কি না জিজ্ঞেস করতে বললেন, আপনাদের জন্য ঘর সব সময়ই আছে। ক'দিন থাকবেন?

সেটা আগে থেকে বলতে পারছি না, বলল ফেলুদা।

আমরা আগেরবারের মতোই একটা চার বেড়ের ঘর পেয়ে গেলাম।

ব্রেকফাস্ট বক্সারেই সারা হয়ে গিয়েছিল, তাই খাবার তাড়া নেই। ফেলুদা বলল, আগে কর্তব্যটা সেরে নিই, তারপর খাবার কথা ভাবা যাবে।

আপনি কি একেবারে বাঘের খাঁচায় গিয়ে ঢোকার কথা ভাবছেন? লালমোহনবাবু চাপা। গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

আপনি যদি হোটেলে থাকতে চান তা থাকতে পারেন।

না না, সে কি হয়? শ্রী মাস্কেটিয়ার্স-ভুলে গেলে চলবে কেন?

মগনলালের বাড়ি বিশ্বনাথের গলির মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। আমরা বারোটা নাগাত রওনা দিয়ে দিলাম। আবার সেই দৃশ্য, সেই শব্দ, সেই গন্ধ। মনে হল এই কবছরে একটুও বদল হয়নি, আর কোনওদিনও হবে না। কয়েকজন দোকানদারের মুখও যেন চিনতে পারলাম।

ক্রমে মন্দির ছাড়িয়ে আমরা গলির একটা মোটামুটি নিরিবিলি অংশে পৌঁছে গেলাম। সব মনে পড়ছে। এর পরে ডাইনে ঘুরতে হবে, তারপর বাঁয়ে মোড় নিয়েই আমরা পৌঁছে যাব মগনলালের বাড়ির রাস্তায়।

আপনি কী বলবেন সেটা ঠিক করে নিয়েছেন? লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন।

ফেলুদা বলল, আমি যে সব সময় আগে থেকে ভেবে কাজ করি তা নয়। একেকটা বিশেষ মুহূর্তে একেকটা বিশেষ আইডিয়া এসে যায়। তখন সেইটে প্রয়োগ করি।

এর বেলাও তাই করবেন?

সেই রকমই তো ইচ্ছে আছে।

মগনলালের বাড়ির সদর দরজার দুপাশে এখনও তলোয়ারধারী দুই প্রহরীর ছবি, এই কবছরে রংটা একটু ফিকে হয়ে গেছে।

আমরা দরজা দিয়ে ঢুকে একতলার উঠোনে পৌঁছলাম। কেউ কোথাও নেই। দুবার কোই হ্যায় বলেও ফেলুদা জবাব পেল না।

চলুন উপরে, বলল ফেলুদা। লোকটার সঙ্গে যখন দেখা করতেই হচ্ছে, তখন নীচে দাঁড়িয়ে থেকে তো কোনও লাভ নেই।

আবার সেই ছেচল্লিশ ধাপ সিঁড়ি, আবার সেই তিন তলায়।

দরজা দিয়ে বারান্দায় ঢুকতে একজন লোক সামনে পড়ল। সে খৈনি ডলছিল, আমাদের দেখে একটু অবাক হয়ে হিন্দিতে প্রশ্ন করল, আপনার কাকে চাইছেন?

মগনলালজী আছেন? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

আছেন, তবে উনি এখন খেতে বসেছেন। আপনারা ওঁর ঘরে অপেক্ষা করুন। চলুন আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি।

আমরা আবার অনেকদিন পরে মগনলালের ঘরে এসে ঢুকলাম। এই ঘরেই লালমোহনবাবুকে নাকাল করেছিলেন ভদ্রলোক। সে ঘটনা কোনওদিনও ভুলব না। লালমোহনবাবুকে নিয়ে রগড় করার একটা বাতিক লোকটার মজ্জাগত।

কাঠমাণ্ডুতেও লালমোহনবাবুর চায়ে এল এস ডি মিশিয়ে দিয়েছিলেন। তাতে অবিশ্যি লালমোহনবাবুকে নিয়ে রগড় করার একটা বাতিক লোকটার মজ্জাগত।

আমরা তিনজন সোফায় বসার পরেই জটায়ু চাপা স্বরে বললেন, কী বলবেন ঠিক করে ফেলুন মশাই। এইবেলা ঠিক করে ফেলুন। আমার মাথায় তো কিছুই আসছে না।

আপনার মাথা দিয়ে তো আর এ মামলা চালাচ্ছি না আমি। আপনি চুপচাপ দেখে যান।

ইয়েটা সঙ্গে আছে?

ইয়ে মানে ফেলুদার রিভলভার সেটা বুঝতে অসুবিধা হল না।

আছে। নার্ভটাকে ঠাণ্ডা করুন। এ সব সিচুয়েশনে সঙ্গে একজন নাভার্স লোক থাকলে বড় অসুবিধা হয়।

কোত্থেকে যেন একটা ঢোলকের শব্দ আসছে, ঘরের দেয়াল-ঘড়ি টিক টিক করছে, নাকে রান্নার গন্ধ এসে ঢুকছে, আমরা চুপচাপ বসেই আছি তো বসেই আছি।

একটা লোকের খেতে এত সময় লাগে? বিড়বিড় করে বললেন লালমোহনবাবু।

কথাটা বলার মিনিট খানেকের মধ্যে একজন লোক এসে ঘরে ঢুকাল। সে যে মুগুর ভাঁজ পালোয়ান তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সে ফেলুদার সামনে গিয়ে বলল, খাড়া হো জাইয়ে।

কিঁউ? ফেলুদার প্রশ্ন।

সার্চ হোগা।

কে হুকুম দিয়েছে তোমায়?

মালিক।

মগনলালজী?

হ্যাঁ।

ফেলুদা। তবু বসে আছে দেখে লোকটা তার দুহাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে অনায়াসে তাকে দাঁড় করাল। ফেলুদা আর কোনও আপত্তি করল না, কারণ এ লোকটার সঙ্গে গায়ের জোরে পেরে ওঠা পাঁচটা ফেলুদারও সাধি নেই।

লোকটা চাপড় মেরে প্রথমেই ফেলুদার রিভলভারটা বার করল। তারপর মানি ব্যাগ আর রুমাল।

এবার ফেলুদাকে ছেড়ে লোকটা লালমোহনবাবুকে ধরল। লালমোহনবাবু অবিশ্যি ফেলুদার সার্চ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই উঠে দাঁড়িয়েছেন হাত মাথার উপর তুলে।

আমাদের তিনজনের সার্চ শেষ হবার পর লোকটা রিভলভার ছাড়া আর সব কিছু ফেরত দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপরেই বাইরে থেকে একটা গলা খাি্করানির আওয়াজ পেলাম। এ আমাদের খুব চেনা গলা।

এ ভাবে আমার পিছে লাগলেন কেন, মিস্টার মিটার? গাঁদিতে বসে মগনলাল প্রশ্ন করলেন। আপনার এখুনো শিকষা হয়নি? কী লাভ আছে আমার পিছে পিছে ঘুরে? আপনি তো সে মোতি আর ফিরত পাবেন না।

আপনি নিজেকে খুব চালাক মনে করেন–তাই না, মগনলালজী?

সে তে আপনিও করেন। বুদ্ধি না থাকলে আর এতদিন বেওসা চালাচ্ছি? বুদ্ধি না থাকলে আমার আপনার ঘর থেকে মোতি বার করে আনতে পারি?

কী মোতি?

পিংক পার্ল। মগনলাল চেঁচিয়ে উঠলেন। কী মাতি সেও কি আপনাকে বলে দিতে হবে?

কে বলল, পিংক পার্ল? ধীর কণ্ঠে বলল ফেলুদা। ইটুস এ হোয়াইট পার্ল। তাও খাঁটি মুক্তো নয়, কালচারড পার্ল-যার দাম অনেক কম। আপনাকে ভাঁওতা দেবার জন্য ওতে পিংক রং করা হয়েছে। আসল মুক্তো চলে গেছে যার জিনিস তার কাছে। অত বেশি বুদ্ধিমান ভাববেন না নিজেকে, মগনলালজী।

আমি অবাক হয়ে ফেলুদার কথা শুনছি। ও কী করে এত সব বানিয়ে বানিয়ে বলছে? কোথেকে ওর এত সাহস হচ্ছে? লালমোহনবাবু দেখলাম মাথা হেঁট করে রয়েছেন।

আপনি সচ বলছেন?

আপনি কীভাবে যাচাই করতে চান করে দেখুন।

মগনলাল তার সামনে রাখা একটা রুপোলি কলিং বেলে চাপড় মারল। পর মুহূর্তেই সেই পালোয়ান লোকটা আবার এসে ঢুকল।

সুন্দরলালের দোকান থেকে ওকে ডেকে আনো! বলে মগনলালজী ডাকছেন। তুরন্ত। ভৃত্য চলে গেল।

কিছুক্ষণ সকলেই চুপ। মগনলাল একটা পানের ডিবে থেকে পান নিয়ে মুখে পুরলেন। তারপর ডিবে বন্ধ করার সময় একটা অদ্ভুত, প্রশ্ন করলেন।

রবীন্দরনাথ টেগোরের গান আপনি জানেন?

এবার মগনলালের চাউনি থেকে বুঝলাম প্রশ্নটা করা হয়েছে জটায়ুকে।

কী আঙ্কল? জবাব দিচ্ছেন না কেন? আপনি বাঙালি আর আপনি টেগোর সং জানেন না?

লালমোহনবাবু মাথা নেড়ে না বোঝালেন।

সচ বোলছেন?

এবারে মাথা নড়ল উপর-নীচে। অর্থাৎ হ্যাঁ। ভদ্রলোক এখনও মাথা তুলতে পারছেন না।

এবার ফেলুদা বলল, উনি গান করেন না, মগনলালজী।

করেন না তো কী হল? এখুন করবেন। দশ মিনিট লাগবে সুন্দরলালের এখানে আসতে। সেই টাইমে টেগোর সং হবে। আঙ্কল উইল সিং। আসুন আঙ্কল—গদিপর বসুন। সোফায় বসে কি গান হয়? গেট আপ, গেট আপ! না গাইবেন তো বড় মুশকিল হবে।

আপনি বার বার ওঁকে নিয়ে এমন তামাশা করেন কেন বলুন তো? বেশ রেগে গিয়েই বলল, ফেলুদা। উনি আপনার কী ক্ষতি করেছেন?

নাথিং। দ্যাট ইজ হোয়াই আই লাইক হিম। উঠুন। আঙ্কল। উঠুন, উঠুন!

নিরুপায় হয়ে লালমোহনবাবু সোফা ছেড়ে উঠে গদিতে বসলেন।

ভেরি গুড। নাউ সিং।

আর কোনওই রাস্তা নেই। তাই ভদ্রলোক সত্যিই গান ধরলেন। আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও।

মগনলাল তাকিয়ায় শরীরটাকে এলিয়ে দিয়ে পাশে রাখা ক্যাশ-বাক্সের উপর তাল ঠুকে তারিফ করতে লাগলেন। এই অদ্ভুত গানের তারিফ হতে পারে এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

প্রায় পাঁচ মিনিট একটানা গেয়ে লালমোহনবাবু আর পারলেন না। বললেন, বাকিটা জানি না।

দ্যাট ইজ এনাফ বললেন মগনলাল। এবার সোফায় গিয়ে বসুন।

লালমোহনবাবু সোফায় বসতেই ঘরে লোকের প্রবেশ হল–সেই পালোয়ান চাকর, আর একজন পুরু চশমাপরা বুড়ো।

আইয়ে সুন্দরলালজী, বললেন মগনলাল? আপনি এত বুঢ়টা হুয়ে গেছেন এই কবছরে তা ভাবতে পারিনি। একটা কাজের জন্য আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি।

সুন্দরলাল গদিতে বসলেন। মগনলাল তাঁর ক্যাশবাক্স খুলে তার থেকে ভেলভোটের বাক্সটা বার করলেন। তারপর বাক্স থেকে মোতিটা বার করে সুন্দরলালকে প্রশ্ন করলেন, গুলাবী মোতি হয় সেটা আপনি জানেন?

গুলাবী মোতি?

হা।

সেরকম তো শুনেছি, কিন্তু চোখে দেখিনি।

আপনি পঞ্চাশ বছর হল দোকান চালাচ্ছেন আর গুলাবী মোতি চোখে দেখেননি? দেখুন এইটে দেখুন। দেখে বলুন তো এটা সচ্চা না ঝুঠা?

সুন্দরলাল মুক্তোটা হাতে নিলেন। দেখলাম তাঁর হাত কাঁপছে! চোখের খুব কাছে এনে মুক্তোটাকে মিনিটখানেক ধরে দেখে সুন্দরলাল বললেন, হাঁ, এতো সত্যিই দেখছি গুলাবী মোতি। অ্যায়স কভী নেহি দেখা।

তা হলে এটা খাঁটি?

ওইসাই তো মালুম হোতা।

এবার মোতিটা দিয়ে দিন আমাকে।

সুন্দরলাল মুক্তোটা ফেরত দিয়ে দিল।

এবার আপনি যেতে পারেন।

সুন্দরলাল ঘর থেকে বেরোনোর পর মগনলাল ফেলুদার দিকে চেয়ে বললেন, আপনি ঝুট বাত বলেছেন, মিস্টার মিটার। এই পার্ল জেনুইন।

এটা কি আপনি সূর্য সিংকে বিক্রি করতে চান?

আমি কী কবি না-করি তাতে আপনার কী?

আপনি তো এখান থেকে দিল্লি যাবেন?

হ্যাঁ, ফাব।

ওখানে তো সূরয সিং রয়েছেন।

সে খবর আমি পেপারে পড়েছি।

আপনি কি বলতে চান তাঁর সঙ্গে আপনার কোনও কারবার নেই?

আমি কিছুই বলতে চাই না, মিস্টার মিটার। দ্য পিংক পার্ল চ্যাপটার ইজ ক্লোজড। আমি ওই নিয়ে আপনার সঙ্গে আর কোনও কথা বলব না।

ঠিক আছে, আমি উঠছি; আমার যে জিনিসটা আপনার কাছে রয়েছে সেটা দয়া করে ফেরত দিন।

মগনলাল আবার কলিং বেল টিপলেন। পালোয়ান এসে দাঁড়াল।

একে এর রিভলভার ওয়াপিস দিয়ে দাও।

পালোয়ান আজ্ঞা পালন করল, ফেলুদা আর আমরা দুজন উঠে পড়লাম।

মগনলালের ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে লালমোহনবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, এখন কেমন লাগছে?

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, লোকটা কী করে যে একটা মানুষের উইক পয়েন্ট ধরে ফেলে!-পাঁচ মিনিট ধরে একটানা রবীন্দ্রসংগীত জীবনে এই প্রথম গাইলাম।

একতলায় এসে ফেলুদা বলল, আজকে যে একটা খুব জরুরি কাজ হয়ে গেল সেটা কি বুঝতে পেরেছেন, লালমোহনবাবু?

জরুরি কাজ? ভদ্রলোক অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

ইয়েস স্যার, বলল ফেলুদা। জেনে গেলাম ও মুক্তোটা কোথায় রাখে।

আপনি কি ওটা আবার আদায় করার তাল করছেন?

৯. গোলাপী মুক্তা সগৌরবে বিরাজমান

কাশীর মতো থমথমে রাত খুব কম জায়গাতেই দেখেছি। সেটা আরও বেশি মনে হয় এই জন্যে যে দিনের বেলা জায়গাটা লোকে জুনে রঙে শব্দে ভরে থাকে। আমরা বারোটার সময় যখন জ্ঞান-বাপী পৌঁছলাম তখন একটা রাস্তার কুকুরের ডাক ছাড়া কোনও শব্দ নেই।

মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করার পর ফেলুদা একটা শেষ-করা চারমিনার পায়ের তলায় ফেলে চাপ দিতেই চাপা গলায় শোনা গেল, মিস্টার মিত্তির বুঝলাম মতিলাল বড়াল হাজির।

কতগুলো অন্ধকার মূর্তি আমাদের দিকে এগিয়ে এল। আমার সঙ্গে তিনজন লোক আছে। আপনি রওনা দেবার জন্য তৈরি?

চাপা স্বরে প্রায় ফিসফিসিয়ে কথা হচ্ছে। ফেলুদাও সেইভাবেই বলল, নিশ্চয়ই। আর, আমাদের গাইড করতে হবে না, আমরা রাস্তা জানি।

তা হলে চলুন।

অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। ফেলুদা আর মতিলালবাবু দুজনেই দেখলাম রাস্তা খুব ভাল করে জানে, আর এই ঘুটিঘুটে অন্ধকারেও বেশ দ্রুতই এগিয়ে চলেছে। এক জায়গায় একটা রাস্তার আলো টিমটিম করে জ্বলছিল। সেই আলোতে দেখে নিয়েছি মতিলালবাবুর তিনজন লোকের মধ্যে একজন ভীষণ ষণ্ডা। বুঝলাম। এই হচ্ছে মনোহর।

মগনলালের রাস্তার মুখে এসে সকলে থামল। ফেলুদা লালমোহনবাবুর দিকে এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বলল, আপনারা এইখানে অপেক্ষা করুন। আমাদের হয়তো মিনিট কুড়ি লাগবে।

কথাটা বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই মতিলালবাবু আর ওই তিনজন লোকের সঙ্গে ফেলুদা মগনলালের বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

কয়েক মিনিট দুজনেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। নিজেদের নিশ্বাস ফেলার শব্দ পাচ্ছি।

অবশেষে লালমোহনবাবু হয়তা আর থাকতে না পেরে ফিসফিস করে বললেন, ওই গুণ্ডাদের সঙ্গে তোমার দাদার যাবার কী দরকার ছিল বুঝতে পারলাম না।

সেটা যথাসময়ে বুঝবেন।

আমার ব্যাপারটা ভাল লাগছে না। ঠিক আছে।

আমার মনে হয় কথা না বলাই ভাল। ভদ্রলোক চুপ করে গেলেন। খুব মন দিয়ে শুনলে দূর থেকে হারমোনিয়াম আর ঘুঙুরের শব্দ পাওয়া যায়। আকাশের দিকে চাইলাম। এত তারা কলকাতার আকাশে কোনওদিন দেখিনি। এই তারার আলোতেই চার পাশ আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে। যতদূর মনে হয়, আজ অমাবস্যা।

বেশি সময় যায়নি, কিন্তু এখনই মনে হচ্ছে অনন্তকাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কতক্ষণ হল? দিশ মিনিট? পনেরো মিনিট? আশ্চর্য! মগনলালের বাড়িতে ডাকাতি হচ্ছে, এখান থেকে ত্রিশ হাত দূরে, কিন্তু তার কোনও শব্দ নেই।

আরও মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে থাকার পর পায়ের শব্দ পেলাম। একজনের বেশি লোক। এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে।

ফেলুদারাই ফিরছে। কাছে এসে বলল, চ।

কাজ হল? রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলেন জটায়ু।

খতম, বলল ফেলুদা! তারপর মতিলালবাবুর দিকে ফিরে বলল, অনেক ধন্যবাদ। আপনার শেয়ারের ব্যবস্থা আমি করে দেব।

আমরা আমাদের হোটেলের দিকে হাঁটা দিলাম।

কথা হল একেবারে ঘরে ঢুকে।

কিছু বলুন, মশাই। আর থাকতে না পেরে বললেন লালমোহনবাবু।

আগে এইটে দেখুন।

ফেলুদা পকেট থেকে লাল ভেলভেটের বাক্সটা বার করে খাটের উপর রাখল।

সাবাস বললেন লালমোহনবাবু। কিন্তু কীভাবে হল ব্যাপারটা একটু বলুন। খুন-খারাপি হয়নি তো?

সেই পালোয়ানটা মাথায় একটু চোট পেয়েছে, সেটা মনোহরের কীর্তি।

কিন্তু ক্যাশবাক্স খুললেন কী করে?

যে ভাবে লোকে খোলে। চাবি দিয়ে।

এ, কি ম্যাজিক নাকি?

নো স্যার। মেডিসিন।

মানে?

সাপলাইড বাই নিরঞ্জনবাবুর বন্ধু ডাক্তার চৌধুরী।

কী সব বলছেন আবোল তাবোলা? কীসের সাপলাই?

ক্লোরোফর্ম বলল ফেলুদা। শঠে শাঠ্যম্। এবার বুঝেছেন?

পরদিন রাত সোয়া এগারোটায় দিল্লি এক্সপ্রেস ধরে তারপর দিন ভোর ছটায় দিল্লি পৌঁছলাম। এর আগের বার আমরা জনপথ হোটেলে ছিলাম, এবারও তাই রইলাম। ফেলুদা ঘরে এসে আর কিছু করার আগে বিভিন্ন হোটেলে ফোন করে খোঁজ নিতে আরম্ভ করল। সূর্য সিং কোথায় আছে। দশ মিনিট চেষ্টা করার পর তাজ হোটেলে বলল, হ্যাঁ, সূর্য সিং এখানেই আছেন। রুম থ্রি ফোর সেভ্ন।

একবার তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারি কি? সৌভাগ্যক্রমে সূরয সিং তাঁর ঘরেই ছিলেন। এক মিনিটে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে গেল। সন্ধ্যা ছটা। হোটেলে ওঁর ঘরেই যেতে হবে। কী কারণ জিজ্ঞেস করেছিল, বলল ফেলুদা। আমি তাকে পিংক পার্ল সংক্রান্ত ব্যাপার বলতে তৎক্ষণাৎ টাইম দিয়ে দিল।

দুপুর বেলাটা কিছু করার নেই। জনপথে একটা চিনে রেস্টোরান্টে খেয়ে দোকানগুলো দেখে তিনটে নাগাত হোটেলে ফিরে এলাম একটু বিশ্রামের জন্য। পৌনে ছটায় বেরোতে হবে। লালমোহনবাবু ফেলুদাকে মনে করিয়ে দিলেন, আপনার ইয়েটা নিতে ভুলবেন না।

ছটায় তাজে পৌঁছে ফেলুদা প্রথমে নীচ থেকে ফোন করে জানিয়ে দিল যে আমরা এসেছি।

আমার ঘরে চলে আসুন, বললেন ভদ্রলোক।

তিনশো সাতচল্লিশে গিয়ে বেল টিপতে যে দরজা খুলল তাকে মনে হল সেক্রেটারি জাতীয় কেউ। বললেন, আপনারা বসুন, উনি এক্ষুনি আসছেন।

ঘর বলতে যা বোঝায় এটা তা নয়; তিনটে ঘর জুড়ে একটা বিশাল সুইট। যেটায় ঢুকেছি সেটা সিটিং রুম। আমরা সোফায় গিয়ে বসলাম।

মিনিট পাঁচেক বসতেই ভদ্রলোক এসে পড়লেন।

ইনি যে অত্যন্ত ধনী সেটা এক ঝলক দেখলেই বোঝা যায়। গায়ে চাস্ত সুট, সোনার টাইপিন, পকেটে সোনার কলম। হাতে পাথর বসানো সোনার আংটি। বয়স পঞ্চান্নর বেশি। নয়। কনের দুপাশে চুলে পাক ধরেছে, বাকি চুল কালো, আর চাড়া দেওয়া গোঁফটাও কালো।

হু ইজ মিস্টার মিটার?

ফেলুদা উঠে দাঁড়িয়ে পরিচয় দেওয়ার ব্যাপারটা সেরে নিল। ভদ্রলোক দেখলাম দাঁড়িয়েই রইলেন।

আপনার সঙ্গে পিংক পার্লের কী কানেকশন? ফেলুদাকে প্রশ্ন করলেন মিস্টার সিং।

ফেলুদা বলল, আমি একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর। জয়চাঁদ বড়াল মুক্তোটা আমার জিন্মায় রেখেছেন যাতে ওটা নিরাপদ থাকে।

কথাটা আমি বিশ্বাস করতে বাধ্য। নই, মিস্টার মিটার। আপনি মালিকের কাছ থেকে যে মুক্তোটা চুরি করেননি তার কী প্রমাণ?

কোনও প্রমাণ নেই। আপনাকে আমার কথা মেনে নিতে হবে।

আমি তাতে রাজি নই।

তা হলে আমার একটা কথাই বলার আছে—আমি মুক্তোটা দেব না। এটা যার জিনিস তাঁর কাছে ফেরত চলে যাবে।

মুক্তোটা দিতে আপনি বাধ্য।

না মিস্টার সিং, আমি বাধ্য নাই। নো ওয়ান ক্যান ফোর্স মি।

চোখের পলকে সূর্য সিং-এর হাতে একটা রিভলভার চলে এল, আর তার পরমুহূর্তেই একটা কান-ফাটানো গর্জন।

কিন্তু সেটা সূরয সিং-এর রিভলভার থেকে নয়, ফেলুদার কোল্ট থেকে। সে সূর্য সিং-এর হাত নামানা দেখেই ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে। আর বিদ্যুদ্বেগে নিজের রিভলভারটা বার করেছে।

গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যয সিং-এর হাত থেকে তার রিভলভারটা ছিটকে বেরিয়ে একটা ঠং শব্দ করে ঘরের পিছন দিকের মেঝেতে পড়ল।

সূরয সিং-এর চেহারা পালটে গেছে। তার চাউনিতে ঘৃণার বদলে এখন সম্ভ্রম।

আমি চল্লিশ গজ দূর থেকে বাঘ মেরেছি, কিন্তু তোমার মতো টিপ আমার নেই। ঠিক আছে, আমি তোমার নামেই চেক লিখে দিচ্ছি, তুমি মুক্তোটা আমাকে দাও।

ফেলুদা পকেট থেকে ভেলভোটের কৌটোটা বার করে সূর্য সিংকে দিল। কেঁটাটা থেকে মুক্তোটা বার করে ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মধ্যে ধরে সেটাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে থাকলেন সূর্য সিং। তাঁর চোখ জ্বল জ্বল করছে।

আমি এটাকে যাচাই করে নিলে আশা করি তোমার আপত্তি হবে না। এতগুলো টাকা…

ঠিক আছে।

শঙ্করপ্রসাদ! হাঁক দিলেন সূর্য সিং। পাশের ঘর থেকে একজন ফিটফট। ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন, বছর চল্লিশোক বয়স, চোখে সোনার চশমা!

স্যার?

একবার দেখো তো এই মুক্তোটা জেনুইন কি না।

শঙ্করপ্রসাদ মিনিটখানেক ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখেই সেটা সূর্য সিংকে ফেরত দিল।

নো স্যার।

মানে?

এটা ফল্‌স। সস্তা সাদা কালচারড পার্লের উপর গোলাপী রং করে দেওয়া হয়েছে।

আর ইউ শিওর?

অ্যাবসোলিউটলি।

সূরয সিং-এর মুখ লাল। কাঁপতে কাঁপতে ফেলুদার দিকে চাইলেন। তাঁর কথা বলতেও যেন কষ্ট হচ্ছে।

ইউ-ইউ–মেকি জিনিস আমাকে পাচার করছিলে?

ফেলুদার মুখ হাঁ হয়ে গেছে।

তা হলে বড়ালের বাড়িতেই নিশ্চয়ই ফল্‌স মুক্তো ছিল, বলল ফেলুদা।

তোমার রিভলভার নামাও।

ফেলুদা নামাল।

এই নাও তোমার ঝুঠা। মোতি।

ফেলুদা বাক্সসমেত মুক্তোটা সূর্য সিং-এর হাত থেকে নিল।

নিউ গেট আউট।

আমরা তিনজন সুবোধ বালকের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে চলে এলাম। যখন লিফ্‌টে উঠছি তখন দেখলাম ফেলুদার কপালে গভীর খাঁজ।

কলকাতা ফেরার পথে ট্রেনে ফেলুদা একটা কথাও বলল না। এমন অবস্থায় যে সে কোনওদিন পড়েনি সেটা আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি।

আমরা ফিরলাম রাত্রে। পরদিন সকলে আমার ঘর থেকে শুনতে পেলাম ফেলুদা গুন গুন করে গান গাইছে।

আমি বসবার ঘরে এসে দেখি ও পায়চারি করছে আর আলোকের এই বর্ণাধারায়-এর সুরাটা ভাঁজছে। আমাকে দেখেও সে পায়চারি, গান কোনওটাই থামল না। আমি অবশ্য খুশি। ফেলুদাকে মনমরা দেখতে আমার মোটেও ভাল লাগে না।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই লালমোহনবাবুর গাড়ির হর্ন শোনা গেল। আমি দরজাটা খুলে দিলাম, ভদ্রলোক ঢুকলেন।

প্রাতঃ প্রণাম! ঘাড় হেঁট করে হাতজোড় করে বলল ফেলুদা। আসতে আজ্ঞা হাক। লালমোহনবাবু কেমন যেন থতমত খেয়ে একটা বাকা হাসি হেসে বললেন, আপনি কি তা হলে...?

আমি অন্ধকার পছন্দ করি না, লালমোহনবাবু, তাই সেখানে আমাকে বেশিক্ষণ ফেলে। রাখা চলে না। ফলস মুক্তোটা যে আপনার গড়পারের সেক্‌রা বন্ধুর কীর্তি সেটা আমি বুঝেছি, আর এটা যে আপনার এবং আমার ভ্রাতার যৌথ প্রয়াস সেটা বুঝেছি, কিন্তু করে। কখন–

বলছি, স্যার, বলছি, বললেন লালমোহনবাবু। অপরাধ নেবেন না। কাইন্ডলি। আর আপনার ভাইটিকেও মাপ করে দেবেন। আপনি মগনলালের হুমকি যেরকম বেপরোয়া ভাবে নিলেন, তাতে আমি অত্যন্ত উদ্বেগ বোধ করছিলুম। ও মুক্তোটা পেয়ে যাবে এই চিন্তাটাই আমি বরদাস্ত করতে পারছিলুম না। ও তিন দিন সময় দিয়েছিল সোম, মঙ্গল, বুধ। মঙ্গলবার আমি সকলে আসি। আপনি চুল ছাটাতে গেলেন, মনে আছে তো? সেই সময় তপেশ আপনার চাবি দিয়ে আলমারি খুলে মুক্তোটা বার করে আমায় দেয়। এক দিনেই ডুপ্লিকেট হয়ে যায়। বুধবার ওটা তপেশকে এনে দিই, ও সুযোগ বুঝে সেটা আলমারিতে রেখে দেয়। যা করেছি তা শুধু আপনার মঙ্গলের জন্য, বিশ্বাস করুন।

আপনাদের ফন্দি অবিশ্যি তারিফ করার মতোই।

আপনি সেদিন যখন মগনলালকে বললেন মুক্তোটা ফলস, তখন আমি ভেবেছিলাম আপনি আমাদের কারসাজি ধরে ফেলেছেন।

না ধরিনি। আপনাদের পক্ষে এতটা মাথা খাটানো সম্ভব সেটা ভাবতে পারিনি। আসলে আপনারা যে ফেলুমিত্তিরের এত কাছে থাকেন সেটা ভুলে গিয়েছিলাম।

জয়চাঁদবাবু নিশ্চয়ই আরও ভাল অফার পাবেন।

অলরেডি পেয়েছেন। কাল এসে সোমেশ্বরের একটা চিঠিতে জানলাম। এক আমেরিকান ভদ্রলোক। এক লাখ পঁচিশ অফার করেছেন।

বাঃ, এ তো সত্যিই সুখবর।

ফেলুদা এবার আমার দিকে ফিরল। আমি একটা গাঁটা কি রুদা এক্সপেক্ট করছিলাম, তার বদলে ও আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলল, তোকে একটা অ্যাডভাইস দিই। এই ঘটনাটার বিষয় যখন লিখবি, তখন তোদের এই কীর্তিটার কথা একেবারে শেষে প্রকাশ করবি। নইলে গল্প জমবে না।

আমি অবিশ্যি তাই করেছি। লোকে আশা করি আমার এই কারচুপিটা মাইন্ড করবে না। তা হলে এবার আসলটা আপনাকে দিয়ে দিই? বললেন লালমোহনবাবু।

ইয়েস, ইফ ইউ প্লিজ, মিস্টার গাঙ্গুলী।

জটায়ু পকেট থেকে লাল ভেলভেটের কৌটোটা বার করে ফেলুদাকে দিল। ফেলুদা বাক্সটা খুলে জানালার কাছে গিয়ে আলোতে ধরল।

গোলাপী মুক্ত সগৌরবে বিরাজমান।